সমন্বয়

নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের ত্রৈমাসিক বাংলা মুখপত্র

৩১তম সংখ্যা আশ্বিন ১৪২১ (অক্টোবর ২০১৪)

সম্পাদকীয়

বীরেন্দ্র কৃষ্ণভদ্রের চণ্ডীপাঠ দিয়ে শুরু আর বলো দুর্গা মাইকি জয়, আসছে বছর আবার হবে, এই নিয়ে আসলে প্রবাসী দুর্গাপূজা। মাঝে থাকে কলকাতা থকে আসা শিল্পীদের গান ও খিচুড়ী ভোগ। নবমীর রাত শেষ হয়েছে। বাতাসে বিজয়া দশমীর ভারাক্রান্ত ছোঁয়া শারদ উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে। ঢাকের বাজনা থেমে গেছে। মণ্ডপের আলো স্তিমিত। অফিস যাওয়া শুরু হয়ে গেছে। মা এলেন, মর্ত্তধামকে আনন্দদান করে কৈলাসে ফিরে গেলেন। নগেন্দ্র বাঙালিকে দিয়ে গেলেন বাঁচার রসদ। সেই রসদ্ মনের ভান্ডারে ধরে রেখে সবাই আগামী বছরের অপেক্ষায় থাকবে।

মায়ের আরাধনা বিভিন্ন রূপে অবশ্য চলতেই থাকবে। তবে শারদ উৎসব বাঙালি সমাজে এক বিশিষ্ট উৎসব যার ব্যাখ্যা বাঙালি সমাজ নিজেও বিস্তারিত ভাবে করে উঠতে পারবে না।

আসলে দুর্গাপূজা এক সুস্থ সবল সমাজ ব্যবস্থার প্রতিভূ। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে, সমাজের প্রতিটি স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুরা এতে ভাগ নেয়। পূজার সাথে সাথে উৎসবও সমান প্রাধান্য পায়। সফল উৎসব সফল আর্থিক পরিবেশের আভাস দেয়। বিশেষভাবে চিন্তা করলে এর্ প্রয়োজনীয়তা ও মূল্যবোধের সমর্থন পাওয়া যাবে। মানুষ সামাজিক জীব। উচ্চ আশা নিয়ে বাঁচা তার অভ্যাস। আসুন সকলে সফল উৎসবের আশা নিয়ে আগামী বছরের অপেক্ষা করি।

শারদ বন্দনা

শরৎ তোমার অরুণ আলোয় অঞ্জলি,
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।
শরৎ তোমার শিশির ধোয়া কুন্তলে
বনের পথে লুটিয়ে পড়া অঞ্চলে,
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি।।
মানিক গাঁথা ওই যে তোমার কঙ্কনে
ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে
কুঞ্জছায়া গুঞ্জরণের সংগীতে
ওড়না ওড়ায় একি নাচের ভঙ্গীতে —
শিউলি বনের বুক যে ওঠে আন্দোলি।।

শরতের শুভ্রসকাল। দূরে নীল আকাশে সাদা সাদা মেঘ উড়ে বেড়ায়, জলভরে কখনও বা সেটা হয়ে যায় কালো, এরই ফাঁক দিয়ে চিড় খেয়ে নেমে আসে সূর্যের আলো, হাল্কা হাল্কা শিশির ভেজা ঘাসে সূর্যের আলো পড়ে চিকমিক করে। এটাই তো শরতের সকাল! একটা মিষ্টি হাওয়া ভেসে নিয়ে আসে সদ্যফোটা শিউলি ফুলের সুবাস। বর্ষার বিদায়! কাকভোরে ঘুম ভেঙ্গে যায় শারদীয়া আবাহনের চণ্ডীপাঠে —

ইয়া দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তি রূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্মৈঃ, নমস্তস্মৈঃ, নমস্তস্মৈ নমো নমহঃ।

সমস্ত শরীর মনে একটা রোমাঞ্চ শিহরিত হয়— দুর্গাপূজা এসে গেছে। স্বর্গের দেবী মা দুর্গা নেমে এসেছেন মর্তবাসীর ঘরে।

এই দুর্গাপূজার আকর্ষণ অনাদিকাল থেকে আমাদের জীবনের

সাথে জড়িয়ে আছে, বয়সের বিভিন্ন স্তরে এই দুর্গাপূজা সময়োচিতভাবে নিজেকে সাজিয়ে আমাদের জীবনের মুহূর্তগুলো রাঙিয়ে দিয়েছে। এই আনন্দ আমাদের সকলের, এর কোনো শ্রেণীভেদ নেই - কোনো জাতিভেদ নেই - কোনো বর্ণভেদ নেই, এই দুর্গাপূজা একটি উৎসব তাই একে বলা হয় শারদোৎসব। এই শারদোৎসবের মাধ্যমে আমরা দৈনন্দিন দুঃখ-বৈষম্য গ্লানি ভুলে উৎসবের মাধুর্য্যে নিজেদের মিলিয়ে দিই। সার্ব্বজনীনতার মাঝে, আজও তাই আবাহন করি সকল মানুষকে — আসুন, আমরা সবাই মিলে প্রাণভরে মা দুর্গাকে প্রণাম জানাই। তিনিই তো দুর্গতিনাশিনি। তাঁকেই কেন্দ্র করে আমরা আনন্দ করি।

সকল মানুষের হয়ে আমরা জানাই প্রার্থনা মায়ের কাছে - তিনি যেন আমাদের সকলকে সুস্থ রাখেন, মানসিকভাবে সুসংগঠিত করেন, যাতে আমরা পুরোনো দ্বেষ ভুলে সকলে একসঙ্গে আনন্দ করতে পারি — যাতে আমরা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শ্রেণীভেদ ভুলে গিয়ে সকলে মিলে মায়ের আরাধনায় মেতে উঠি। আমাদের শারদীয়া শুভেচ্ছা এবং নমস্কার আপনাদের সকলের কাছে।

চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন
জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা পুণ্যপীযুষ স্তন্য বাহিনী
অয়ি ভুবনমনোমোহিনী।'

নয়ডা বেঙ্গলি কালচারাল এসোসিয়েশন

মধুবাতা ঋতায়তে

সনাতন মুখার্জী

পৌরাণিক মতে মহামায়ার ৫১টি শক্তিপীঠ আছে। কাশ্মীরের শারদামন্ডল তারমধ্যে অন্যতম। এখানে সতীমায়ের কণ্ঠ পড়েছিল। শান্ডিল্য মুনি কাশ্মীরের শারদা বনে ত্রিশক্তি রূপে শারদার দর্শন পান। আবার জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য শারদা পীঠের গহ্বরে সরস্বতী, শক্তি ও দুর্গার সম্মিলিত রূপ দর্শন করেন। এখানেই শান্ডিল্য মুনি রচনা করেন বিখ্যাত স্তোত্র —

'মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ

মাধর্বীনঃ সন্তোষধী, মধুনক্তসুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।।

মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা মধুমান্নো বনস্পতি মর্ধুমাংস্তু সূর্যঃ।

মাধবীর্গাবো ভবন্তু নঃ।।

মদুবাতা ঋতায়তে - বায়ুসকল আমাদের সুখস্পর্শ হউক।

মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ - নদী ও সমুদ্র সকল আমাদিগকে স্ব স্ব মধুর রস প্রদান করুন।

মাধর্বীনঃ সন্তোষধী - ওষধী সকল আমাদের জন্য মধুময় হোক।

মধুনক্ত সুতোষসো -রাত্রি ও দিন আমাদের জন্য মাধুর্য্যযুক্ত হোক।

মধুমৎ পার্থিবং রজঃ - পৃথিবীর যাবতীয় লোক আমাদের জন্য মধুময় হোক।

মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা - পিতা স্বরূপ দৃষ্টি প্রদানে যিনি দুঃলোককে রক্ষা করেন।

মধুমান্নোবনস্পতি - অরণ্যসকল মধুবর্ষণকারী হোক আমাদের জন্য।

মধুমাংস্তু সূর্য্য ঃ সূর্য্য আমাদের প্রতি মধুর ভাব যুক্তহোক।

মাধবীর্গাবো ভবন্তু নঃ- গাভী সকল আমাদের জন্য মধুর রস প্রদান করুক।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনীতে আছে তিনি যে বৃক্ষের নিচে সাধনা করেছিলেন, একদিন বিহ্বল হয়ে গাছের দিকে তাকিয়ে আছেন-দেখছেন, গাছের পাতা থেকে টপ্ টপ্ করে মধুর রস পড়ছে।

ঈশ্বর আমাদের সকলকে মধুর ভাব প্রদান করুন। সকলের জীবন মধুময় হোক।

নমঃ মধু নমঃ মধু নমঃ মধু।

একটি সুন্দর মুহূর্ত

বিপ্লব দাশগুপ্ত

ঘেঁটু একটা বস্তির ছেলে। বয়স বার কি তের হবে। পরনে একটা ফাটা হাফপ্যান্ট আর গায়ে একটা হাতকাটা গেঞ্জি। এই বয়সেই দুনিয়াকে বুঝতে শিখে গেছে, টালিগঞ্জের কবরখানার পাশে ফালাকাটা বস্তীতে থাকে। দুনিয়াতে ও শুধু একজনকেই মানে, সে হচ্ছে আমিনা দিদি, এই তো সেদিন বস্তীর ছেলেদের সাথে ডান্ডাগুলি খেলতে খেলতে মাথায় চোট লেগে অনেক রক্ত বেরিয়েছিল। দুহাতে মাথাটা টিপে রাস্তায় বসে পড়েছিল, কোথা থেকে খবর পেয়ে ওর আমিনা দিদি ছুটতে ছুটতে ওর কাছে আসে। ওকে জড়িয়ে ধরে নিজের কোলে ঘেঁটুর মাথাটা টেনে নেয়। নিজের শাড়ির আঁচল থেকে ছিঁড়ে ওর মাথায় পট্টি বেঁধে দেয়.. তারপর বাড়ি নিয়ে আসে। অনেক সেবা করেছিল আমিনা দিদি । পাড়ায় কবিরাজ কাকার কাছে নিয়ে গিয়েছিল, ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিল... সারারাত ধরে মাথা টিপে দিয়েছিল, খুব আরামে ঘুমিয়ে পড়েছিল ঘেঁটু।

এই আমিনা দিদি ছাড়া ঘেঁটুর আর কেউ নেই। আমিনা দিদির কাছ থেকেই শুনেছিল যে ওকে নাকি আস্তাকুঁড় থেকে তুলে এনেছিল আমিনা দিদি । ওই কবরখানার পিছনে একটা পোঁটলার মধ্যে বেঁধে কেউ ফেলে রেখে গেছিল। সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছে, তারপর থেকে এতগুলো বছর কেটে গেছে। বস্তীর ছেলেরা ওকে বলত 'খোটা সিক্কা', আমিনা দিদি ওদের সাথে ঝগড়া করেছে তারপর বলেছে, 'ও আমার ছোট ভাই, খুদা ওকে পাইয়ে দিয়েছে।' আমিনা দিদিই ওর নাম দিয়েছিল ঘেঁটু কারণ ময়লা ঘেঁটেই তো ওকে খুঁজে পেয়েছে।

ঘেঁটু একদিন ওর আমিনা দিদিকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'দিদি আমাকে তো তুমি আস্তাকুঁড়ে থেকে কুড়িয়ে পেয়েছ, তুমি কোথা থেকে এসেছ। তোমারও কি বাবা-মা নেই?' আমিনার চোখ দিয়ে জল এসে গিয়েছিল, বলেছিল, 'ভাই তুই ছাড়া আমার কেউ নেই। আমার বাড়ি ছিল, সেখানে আমার বাবা-মা সবাই ছিল। একটা গ্রামে আমাদের বাড়ি ছিল, একদিন একটা লোক আমাদের বাড়িতে এসেছিল, আমি তখন খুব ছোট। আমার বাপ-মা সেই লোকটার হাতে আমাকে তুলে দিয়ে বলল, 'ওর সাথে শহরে যাব খেতে পরতে পারবি... ভাল থাকবি"। সেই লোকটা আমাদের মত কিছু ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলকাতায় এল। কয়েকটা দিন আমাদের একটা পুরানো পোড়া বাড়িতে রেখেছিল। তারপর একদিন আমাকে একটা বাড়িতে কাজে লাগিয়ে দিল বলল, ভাল হয়ে থাকবি.. ওরাই খেতে দেবে। সেই বাড়িতে অনেকগুলো লোক পালা করে থাকত, রাতের বেলায় নেশা করত। ওদের সেবা করা... গা হাত পা টিপে দেওয়া আমার কাজ ছিল। একদিন রাত্রিবেলায় সুযোগ বুঝে আমি পালিয়ে গেলাম ওদের ডেরা থেকে। সারা রাত ধরে হেঁটেছি... যখন হাঁফিয়ে গেছি কোনো পার্কের ধারে বসে পড়েছি.. আবার হেঁটেছি, ... ভোরবেলায় একটা চায়ের দোকানের সামনে এলাম। তখন সবে দোকানের ঝাঁপ তুলছে... ভীষণ খিদে পেয়েছিল। দোকানের লোকটাকে বললাম, 'কিছু খেতে দেবে? বড্ড খিদে পেয়েছে। জানি না লোকটা আমায় দেখে কি করুণা হল, বলল 'বাসি রুটি আর আলুর ঘ্যাঁট আছে... খাবি?' আমি মাথা ঝাঁকিয়ে দিলাম। তাকেই বললাম, 'আমি তোমার দোকানে কিছু কাজ করতে পারি?' লোকটা রাজী হয়ে গেল, শুধু বলল, কোনো পয়সা পাব না তবে দুবেলা খেতে পারব। আমি সেখানেই রয়ে গেলাম। ওই দোকানের ভিতরেই চাটাই পেতে শুতাম। এইভাবেই ঘুরতে ঘুরতে একদিন এই ফালাকাটা বস্তিতে পৌঁছে গেলাম। আমিনা দিদির কোলে মাথা রেখে ওর জীবনের ঘটনাগুলো শুনেছিল ঘেঁটু, তারপর ওর কোলে মুখ গুঁজে বলে উঠেছিল, 'আমাকে ছেড়ে তুমি যাবে না তো দিদি'। ঘেঁটুকে আরও ঘন করে নিজের কোলে জড়িয়ে আমিনা বলে উঠেছিল, 'না রে ভাই, তুই ছাড়া আমার তো আর কেউ নেই!'

এই ফালাকাটা বস্তীতে আমিনা সকলের কাছেই খুব প্রিয়। অনেক বছর হয়ে গেল, এই বস্তিতেই আমিনা বড় হয়েছে। সেই ছোট অবস্থায় এসেছিল, এই বস্তিরই এক কাকুর হাত ধরে ওই চায়ের দোকানে আলাপ হয়েছিল। তখনই বলেছিল, 'তুই এখানে কি করছিস? আমাদের বস্তিতে যাবি... সব ঘরে জল তুলে দিবি... কাপড় কেচে দিবি... আমার তো তোর কাকিমা ছাড়া কেউ নেই, আমার কুঁড়ের এক কোণায় চাটই বিছিয়ে শুতে পারবি, যে যে ঘরে কাজ করবি, তোকে মাসে একশো করে টাকা দেবে আমি তোকে কিছু দেব না.. কিন্তু খেতে দেব, সেই কাকুর কথায় রাজী হয়ে গেছিল আমিনা, চলে এসেছিল এই বস্তিতে। কাকু-কাকীমা দুজনেই ঠেলা করে সব্জী বিক্রি করে... ফল বিক্রী করে যখন যা জোগাড় করতে পারে। দুজনেই কাকভোরে পান্তা খেয়ে বেরিয়ে যায়... তারপরই শুরু হয় আমিনার কাজ। সাত-আটটা ঘরে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল কাকু। সব বাড়ি থেকে জলভরার বাসন নিয়ে লাইন দেয় কর্পোরেশনের জলের গাড়ির সামনে, সবার

আগে থাকে আমিনা। কারণ অতভোরে আর কেউ আসতে পারে না। ও এক সাকরেদও জুটিয়ে নিয়েছিল, সে সব ঘর থেকে জল ধরার বাসন নিয়ে আসে এক এক করে, জলভরা হয়ে গেলে কাপড় ধোয়ার কাজ শুরু হয় পিছনের পানাপুকুরে । সব কাজ শেষ হলে নিজের আস্তানায় ফিরে পান্তা খেয়ে নেয়। এরই মধ্যে আমিনা ছুটে যায়, বস্তিতে কারও ঘরে যদি কারোর শরীর খারাপ হয়, তার সেবা করতে। এই সেবা করতে খুব আনন্দ পায় আমিনা এরজন্য কোনো পারিশ্রমিক পায় না, সকলের এই সেবা করেই এত জনপ্রিয় হয়ে গেছে আমিনা যে সকলেই কিছু হলে, ওকেই ডেকে পাঠায়। কোথাও কিছু খেতে দেয় তো খেয়ে নেয়, এই ভাবেই আমিনার দিন কেটে যায়। কেটে গেছে এতগুলো বছর... আমিনা এখন বেশ বড় হয়ে গেছে। কিন্তু ওর মনে কখনও প্রেম, ভালবাসা এই সবের প্রশ্ন জাগে নি। একজন বাড়ন্ত মেয়ের যে সহজাত প্রবণতা থাকে, আমিনার মধ্যে সে সবকিছুই বোঝা যায়নি। কেউ কিছু বললে, হেসে জবাব দিত, 'তোমাদের সেবা করতে পারলেই আমি খুশি। আমিনা এইভাবেই নিজের দাপট জমিয়ে নেয় কিন্তু একদিন ওর জীবনে সবথেকে সাঙঘতিক ঘটনা ঘটে। হঠাৎ একদিন সকালে খবর পায় টালিগঞ্জ নালার ধারে কোন এক ট্রাকের ধাক্কায় ওর কাকুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ছুটে যায় আমিনা অনেক ভীড় জমে গেছে সেখানে বস্তীরও অনেকে জড় হয়েছে ওই ভীড় কাটিয়ে যখন আমিনা এগিয়ে যায়...দেখে মাটিতে পড়ে আছে ওর কাকু আর কাকিমার রক্তাক্ত দেহ। সব্জীর ঠেলাটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। সব সব্জীগুলো এদিক-ওদিকে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কাকু-কাকীমার শরীরটা একেবারে থেঁতলে গেছে। সবকিছু দেখে আমিনার মুখের স্বর বন্ধ হয়ে গেছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে আমিনা... কি করবে ভেবে পাচ্ছে না, পুলিশ এল... সব কিছু দেখে সনাক্ত করল যে ওর কাকু-কাকিমা দুজনেই মারা গেছে, বস্তীর কিছু লোক ওকে চিনতে পেরেছিল। আমিনা কাঁদতেও ভুলে গেছে। ওই লোকেরা আমিনাকে ধরে বস্তিতে ওর আস্তানায় ফিরিয়ে আনে । তারপর নাকি ওরা ওর কাকা-কাকিমাকে শ্মশানে নিয়ে যায় । কেন কি কারণ কিছুই জানে না আমিনা বা বুঝতে পারে না। কারণ কোনোদিন তো এইসব দেখেনি। ও নিজের ঘরেই চুপচাপ বসে থাকে। বস্তিরই কেউ ওর জন্য খাবার এনে খাইয়ে দেয়। এইভাবে দু-তিনদিন কেটেছিল আমিনার — ঘরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। তারপর ধীরে ধীরে সব সয়ে গেছে... পেটের তাগিদে কাজে বেরোতে হয়েছে। বস্তীর লোকেরাও ওর সাথ দিয়েছে। সেই থেকে ওর কাকুর ঘরের মালিক হয়েছে আমিনা।

নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে আমিনা। সুন্দরভাবে এই বস্তীর পরিবেশে। এখন আর ওকে জল ভরতে হয় না। ও এখন মালিশের কাজ করে । বস্তীর মানুষকে দরকার মত সেবার নামে মালিশ করে, কোনো পয়সা নেয় না। কিন্তু বাইরেও অনেক বাড়ির কাজ করে । দশ-বারো ঘর আছে যেখানে বয়স্ক মানুষদের মালিশ করতে হয়। তাদের ব্যবহারও ভাল, আর ভাল রোজগারও হয়। এইভাবেই দিন কাটছিল আমিনার সেই একদিন মালিশ করতে যাবার সময় রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পায় ছোট্ট একটা শিশুকে। কাপড়ে জড়ানো ছিল সর্বাঙ্গ। আস্তাকুঁড়ের একপাশে রাখা ছিল পুঁটলিটা , বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। হয়তো উপরওয়ালার এটাই অভিপ্রায় ছিল। পুঁটলিটার পাশ কাটিয়ে যখন যাচ্ছিল হঠাৎ পুঁটলিটা নড়ে উঠল। চমকে গেছিল আমিনা... দু পা সরে গেছিল ভয় পেয়ে । তারপর একটা উৎসুকুতা নিয়ে কাছে গেল... পুঁটলিটার কাপড় সরাতেই দেখতে পেল একটা শিশু... কেউ বোধহয় সদ্য ছেড়ে গেছে। আমিনা পুঁটলিটা ওর হাতে তুলে নিল... শিশুটি ছোট্ট করে কেঁদে উঠল। আমিনার মনটা নরম হয়ে গেছিল। কে ফেলে গেল এই শিশুকে? এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, কাউকে বুঝতে পারল না। সব লোকই নিজের কাজে এগিয়ে চলেছে । আমিনা আর কাজে যেতে পারল না। শিশুকে নিয়ে ও বাড়ি ফিরে এল। বস্তীতে একজনকে বৌদি বলত - কল্পনা বৌদি। তার ঘরে নিয়ে তুলল শিশুকে , সব কথা খুলে বলল। সময়টা ছিল দুপুর বেলা। বস্তীর সব পুরুষ মানুষ কাজে বেরিয়ে গেছে। বস্তীরই কিছু বয়স্ক মেয়েমানুষ এসে গেল কল্পনা বৌদির ঘরে। সবাইকেই জানে আমিনা। তারা ভালবাসে আমিনাকে। সকলে মিলে শিশুটির ভার তুলে নিল। কল্পনা বৌদির ঘরে দুধ ছিল,তাই গরম করে শিশুকে খাওয়ানো হল চামচ দিয়ে। সেখানেই প্রাথমিক ঠিকানা হয়ে গেল শিশুটির। আমিনা শুধু বলেছিল, ওর সবখরচ সে দেবে । বস্তির মহিলারা সবাই শিশুটিকে মেনে নিল । ওকে পালন করতে আরও কিছু মহিলা এগিয়ে এল, কিন্তু কল্পনা বৌদি সবাইকে সরিয়ে নিজেই সব দায়িত্ব নিল। সেই থেকে আমিনার কাজ আরও বেড়ে গেল। ওকে আরও রোজগার করতে হবে মালিশ করার কাজ আরও দু-তিনটে ঘরে বাড়িয়ে নিল। সকাল থেকে রাত অবধি ওর কাজ । মাঝে মধ্যে সময় করে কল্পনা বৌদির ঘরে শিশুটিকে দেখে যাওয়া । কল্পনা বৌদির বর ও খুব ভাল ছিল। সেও সব কথা শুনে এই ব্যবস্থাটা মেনে নিয়েছিল। এতে আমিনার খুব সুবিধা হয়েছিল। কোনো লুকোচুরির ব্যাপার ছিল না। আমিনা শিশুটার নাম দিয়েছিল ঘেঁটু। তিলে তিলে দশটা বছর ধরে ঘেঁটুকে আগলে

রেখেছে আমিনা... ওর জীবনের একমাত্র সাথী। ঘেঁটু আজ একটা চায়ের দোকানে কাজ করে। এছাড়াও লোকের বাড়িতে ফাই ফরমাশ খাটে। কার রেশন তুলতে হবে, কার ইলেকট্রিক বিল জমা দিতে হবে, কার বাচ্চাকে পার্কে নিয়ে যেতে হবে বিকেলে, সব কাজ করে ঘেঁটু। সকলের কাছে ঘেঁটু ভীষণ বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছে। এইসব কাজ করে কিছু রোজগার করতে শিখেছে ঘেঁটু । দিনের শেষে যখন আমিনা ঘেঁটুকে নিয়ে কবরখানার মাঠে বসে, তখন আর কিছুই মনে থাকে না, রাতের অন্ধকার নেমে আসে... আমিনার কোলে মাথা রেখে ঘেঁটু শুয়ে থাকে। আমিনা ওকে জড়িয়ে কত না আদর করে। নিঃশব্দে সময় কেটে যায়। তারপর এক সময় দুজনে বস্তির ঘরে ফিরে আসে।

এমনি করেই ওদের দিন কাটে। দেখতে দেখতে দুর্গাপূজা এসে যায়, চায়ের দোকানের মালিক বলে দিয়েছে ঘেঁটুকে যে পুজোর সময় সারারাত দোকান খোলা রাখতে হবে। সুতরাং কেউ যদি তখন কাজে না আসে, তবে তাকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হবে। ঘেঁটুর এই দুর্গা পুজোটাকে খুব ভাল লাগে । ওদের পাড়ায় একটা বেশ বড় দুর্গাপূজা হয়, বিরাট বড় প্যান্ডাল - খুব সাজানো হয়। অনেক লোকজনের ভীড়, কত রকম জিনিসের মেলা বসে রাস্তার ধারে, বেলুন, নানা ধরনের খেলনা, বাঁশি, জামাকাপড়, আরও কত কিছু। সেই সঙ্গে খাবারের দোকান। ওখান থেকে কিছু খাবার খেতে খুব ইচ্ছে হত - কিন্তু ওর কাছে তো পয়সা নেই? দুপুরে খিচুড়ি ভোগ হত। অন্য সব বস্তীর ছেলেদের সাথে সেও খেতে যেত। ঢাকের বাজনার সাথে সে-ও নাচত। এক পাশে দাঁড়িয়ে কখনো কখনো প্যান্ডেলের লোকেরা ওদের তাড়া করে আসত। তখন ওরা দলবল মিলে পালিয়ে যেত। কাপড় জামার কথায় হঠাৎ ওর মনে হল আমিনা দিদির কথা, এখন তো ও কিছু রোজগার করে। ঘেঁটু দেখেছে ওর দিদির বয়সী মেয়েরা কতরকম সুন্দর সুন্দর শাড়ি, সালোয়ার কামিজ পরে, কল্পনা মাসিও পরে... কিন্তু ওর দিদি পরে না, ওর খুব ইচ্ছে দিদিকে সাজাবার। দোকানের মাইনে নিয়ে ওর কাছে জমানো তিনশো টাকা আছে, সেই টাকাটা নিয়ে ও চলে গেল চুপি চুপি কল্পনা মাসীর কাছে... ওর মনের ইচ্ছা বলল। কল্পনা মাসীও রাজী হয়ে গেল। একদিন দুপুরে চায়ের দোকান থেকে ছুটি নিয়ে কল্পনা মাসীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পুজোর বাজার জমিয়ে রাস্তার ধারে বসেছে। সেখান থেকে সুন্দর দেখে একটা লাল-হলুদ শাড়ী কিনল সেই সঙ্গে কিছু রঙবেরঙের কাঁচের চুড়ি, মাথার টিপ একটা পাউডারের বাক্স কিনল। এই সব লুকিয়ে কল্পনা মাসীর কাছে রেখে দিল আমিনা । দিদি জানতেও পারল না।

এদিকে আমিনাও প্রতি বছরের মত ভাইয়ের জন্য দুটো নতুন জামা, দুটো হাফ প্যান্ড কিনল। ঘেঁটুকে সঙ্গে করেই নিয়ে গেছিল এইসবকিনতে, তবে এইবার আমিনার ইচ্ছা হল ভাইয়ের জন্য একটা চপ্পল কেনার। খালি পায়ে দোকানে যায়, আর পাঁচটা মানুষের বাড়ি যায়... ওর ভাল লাগে না দেখতে, আর ও না কিনলে ভাইতো কিনবেনা। পুজোর বাজার করে খুব খুশি ঘেঁটু। মনে মনে আরও ভাল লাগে যে এবার পুজোতে ঘেঁটুও ওর দিদিকে সাজাবে। দুচোখ ভরে দেখবে, দিদিকে সাজলে কেমন লাগে দেখতে। চুপচাপ শুধু দিদির দিকে ঘুরে ঘুরে তাকায়।

দুর্গাপূজা শুরু হয়ে যায় । চায়ের দোকানের মালিককে অনেক হাতে পায়ে ধরে ঘেঁটু রাজী করিয়েছে যে পুজোর প্রথম দিন ও ছুটি নেবে রাত নটা অবধি, রাত্রি নটার সময় ও এসে যাবে আর সারা রাত থাকবে। সেইমত পুজোর দিন সকালবেলা দেখল ওর দিদি স্নান সেরে নিয়েছে - ওকেও স্নান সেরে নিতে বলল - নতুন জামাকাপড় পরতে হবে, সেই মত ঘেঁটু স্নান সেরে নতুন জামা কাপড় পরে নিল। তারপর ওর দিদিকে নিয়ে কল্পনা মাসীর বাড়িতে গেল। সব কিছু আগেই ঠিক করা ছিল। ওরা যেতে কল্পনা মাসী ওর দিদিকে ঘরে নিয়ে গেল। বাইরে বসে রইল ঘেঁটু, দাওয়ায় বসে বসে চিন্তা করছে ওর দিদিকে কেমন লাগবে নতুন শাড়িটা পরে। কিছুক্ষণ বাদেই ওর দিদিকে নিয়ে কল্পনা মাসী বেরিয়ে এল। দিদির পরণে সেই লাল-হলুদ শাড়ি মাথায় টিপ, চোখে কাজল, মুখে পাউডার, হাতে চুড়ির গোছা। দিদি ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে, চোখ ফেরাতে পারছে না ঘেঁটু । ওর দিদিকে এত সুন্দর দেখতে? ওর দিদির চোখে জল। আজ ঘেঁটুর চোখেও জল এসেছে, আমিনা এগিয়ে এসে ভাইকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে আদর করে, ভাই... তুই কিনেছিস... আমার জন্য?..' ঘেঁটু কিছু বলতে পারে না, দিদির আঁচলে নিজের মুখটা লুকায়। আমিনার চোখ দিয়ে নিঃশব্দে অঝর ধারে জল ঝরে পড়ছে। দুই ভাইবোন দুজনকে জড়িয়ে রয়েছে। আমিনা ওর ভাইয়ের মুখটা দেখার জন্য দু হাতে ওর মুখটা তুলে ধরে ওর দিকে নির্বিশেষে চেয়ে থাকে। ঘেঁটু অস্ফুট বলে ওঠে? তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না তো দিদি? কি বলবে আমিনা, ঘেঁটু যে তার জীবনের একমাত্র সাথী। চোখের জল আজ আর বাধা মানছে না। এই কাঁদার মধ্যে যেন অন্য একটা সুখ জড়িয়ে আছে। কোনো কথাই আসে না মুখে। নিজের ঘাড় নাড়িয়ে শুধু জবাব দেয় 'না'। তারপর আবার আদর করে নিজের বুকে টেনে নেয় ঘেঁটুকে। এক অজানা নাড়ীর বন্ধনে আবদ্ধ দুই ভাই বোনের এই মিলনে নীরব সাক্ষী থাকে কল্পনা মাসী .... একটা সুন্দর মুহূর্ত্তের ।

লাফিং ক্লাব

রমা আচার্য

ছেলেবেলা হতেই আমি
হাসতে ভালোবাসি।
তাইতো আমি প্রতিদিনই
লাফিং ক্লাবে আসি।
আমরা দেখি ভোরের বেলা
প্রথম সূর্যোদয়,
ছটা বাজতেই আমাদের
ব্যয়াম শুরু হয়।
মাঠে তখন ঠান্ডা হাওয়া
পূবের আকাশ লাল
প্রতিদিনই পাই যে মোরা
তরতাজা এক সকাল।
হাসি আছে অনেকরকম
তার প্রভেদ রাশিরাশি
দেঁতো হাসি, মুচকি হাসি
হা-হাহা অষ্টহাসি,
বিশ্বহৃদয়ে জয় করেছে
মোনালিসার হাসি,
লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিকে
তাই তো ভালোবাসি।
শিশুর হাসি দেখলে পরে
মন যে ভরে যায়
মায়ের হাসি স্নেহের হাসি
সেকী ভোলা যায়!
হাসি দিয়ে সবাইকে যে
কাছে টানা যায়,
হাসি মোরা প্রয়োগ করি
প্রথম অর্ভথনায়।
হাসির আছে অনেক জাদু
হাসতে জানা চাই,
প্রাণখুলে যে হাসতে পারে
তুলনা তার নাই।

আমাদের কথা

সুমনা চ্যাটার্জী দাস

আমাদের কথা বলে যেতে পারি আজ
সব কাজ ভুলে যদি শুনে যেতে চাও
যদিও এ শুধু দেশ কাল ছাড়া গল্প
আমাদের কথা পুরনো হবে না তাও

আমাদের ভোরে শিউলি গন্ধ নেই
এখানে সকাল দাঁত বের করে হাসে
আমাদের সাঁঝে প্রদীপ জ্বলে না কোনো
এবং রাত্রি বড় অকপটে আসে

তোমাদের দিন-রাত ভরা জলছবি
আমাদের রং তোমাদের থেকে ভিন্ন
তোমরা যখন আনন্দে ছটফট কর
আমাদের দেহ অকারণ অবসন্ন

আমরা তবুও মনে মনে বেঁচে আছি
এগিয়ে চলেছি অবিরাম সারাক্ষণ
সব চলে গেছে শুধু পড়ে আছে এই
ক্লান্ত শ্রান্ত চির অশান্ত মন

আমাদের কথা বলে যেতে পারি আরো
সব কিছু ফেলে যদি মন দিয়ে শোনো
বলে যেতে পারি দিন রাত্তির ভোর
আমাদের কথা ফুরোবে না কক্ষনো।

সেই গান

শ্রী মধুসূদন ভট্টাচার্য

সেই গানটা তুমি কী গাইতে পার—
যে গানের সুর মনকে ভাসায় অকূল মাঝদরিয়ায় ?
সেই গান তুমি কী শোনাতে পার —
যে গানের সুর পথহারাকে জীবনের পথ চেনায় ?
সেই গান তুমি কী গইতে পার —
যে গান বসন্তোৎসবে হৃদয় রাঙায় ?
সেই গান তুমি কী শোনাতে পার —
যে গানের সুর জীবনসংঘাতে হারিয়ে যাওয়া প্রেমিক
প্রেমিকাকে হৃদয়ের কাছে এনে দেয় ?
সেই গান তুমি কী গাইতে পার —
যে গান শুনে প্রাণ মৃত সঞ্জীবনী সুধারসে ভরে রাখা যায় ?
সেই গান তুমি কী শোনাতে পার —
যে গান শুনে জীবনের সকরুণ দুঃখ ভুলে থাকা যায় ?
সেই মল্লার রাগ তুমি কী গাইতে পার -
যা মেঘলোক থেকে সুখা-রুখা মরশুমে শস্যক্ষেতে জল ঝরায় ?
সেই অগ্নিজ্বলা দীপক বাঘিনী তুমি কী শোনাতে পার —
যা কঠিন শীতের রাতে শীতার্ত নিবাসী পথ শিশুদের
উষ্ণতা যোগায় ?
সেই গান তুমি কী গাইতে পার — যা বিকলাঙ্গ উন্মাদ
নরনারীর ক্লীবত্ব জড়তা ঘোচায় ?
সেই গান তুমি কী শোনাতে পার - যা মর্মন্তুদ বেদনার্ত
মৃত্যুপথযাত্রীর অশ্রুজল মোছায় ?
সেই গান তুমি কী গাইতে পার যা শুনে স্বামী স্ত্রীর
ভুল বোঝাবুঝির বিবাহ বিচ্ছেদ না ঘটায় ?
সেই গান তুমি কী ধরতে পারে যা সকল ভেদাভেদ ভুলে
মানুষ মানুষকে কাছে টেনে আনে আর ভালবাসা শেখায় ?
সেই গান তুমি কী শোনাতে পার যা সচ্চিদানন্দকে চিনতে
শেখায় ?
গৌড় সারংয়ের সেই সুর তুমি কী ছড়াতে পার
যা জীবের অজ্ঞানতার মোহ ঘুম ভাঙায় ?
এতসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে খুঁজে বেড়াই —
উত্তর না পেয়ে ছুটে যাই
সংক্ষুব্ধ সমুদ্র ঢেউয়ের জলোচ্ছ্বাসে আছড়ে পড়া দণ্ডায়মান
বিবেকানন্দ মিনারে শুনতে পাই
সেই মহর্ষির অস্ফুট আক্ষেপ ধ্বনি !
'কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই !'
ভাবি মনে, বুঝিবা এর উত্তর নাই নাই নাই।

শুভঙ্করী

সনৎ চক্রবর্তী

আলোর মাঝে নাচে বামা
পূজার ছলে সাজাই তারে
সেই তো আমার হৃদয় শ্যামা
ধূপের গন্ধে মাতাই যারে।
সবাই বলে ভয়ঙ্করী
আমি ডাকি শুভঙ্করী
মুণ্ডমালা গলে ঝোলায়
শিবকে শোয়ায় পায়ের তলায়
ত্রিনয়নে লাগিয়ে কালি
মা হয়েছে রূপের ডালি
ঘুরে বেড়ায় এলোচুল
কানে গোঁজে জবার ফুল
সবাই বলে ভয়ঙ্করী
আমি ডাকি শুভঙ্করী।

অথ বঙ্গসংস্কৃতি বিচিত্রা

সমৃদ্ধ দত্ত

এদিকে গড়িয়া আর ওদিকে দমদম। এদিকে বেহালা আর ওদিকে হাওড়া ব্রিজ। ব্যস। কলকাতা মনে করে এটাই বাংলা। লক্ষ্য করে দেখবেন কলকাতার কোনও বনেদি ক্লাবের বার্ষিক আলোচনাসভা কিংবা টিভি চ্যানেলের প্যানেল ডিসকাশনে বেশ কিছু ফেভারিট সাবজেক্ট আছে। যেমন ধরুন নতুন প্রজন্ম বাংলা বই পড়ে না। সাহিত্যে তাদের অরুচি। বাংলা সাংস্কৃতির সঙ্গে তাদের যোগ প্রায় অবলুপ্ত। এই প্রজন্ম সোস্যাল নেটওয়ার্ক সাইটেই নিজেদের আবদ্ধ করে রেখেছে। বাঙালিয়ানা বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। নাইটক্লাব সংস্কৃতি আর সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টই নাকি এই প্রজন্মের ধ্রুবপদ। এই সব হা হুতাশ আবর্তিত হয় আদতে ওই প্রথমেই উল্লেখ করা এলাকাগুলির মানচিত্র মাথায় রেখে। কারণ এই আলোচক তথা সমালোচকরা আদৌ খোঁজ নেয়ার কষ্ট করেন না যে বনগাঁ কিংবা জলপাইগুড়ির পাড়ার লাইব্রেরীগুলি কিভাবে চলছে। এই যে রাজ্যজুড়ে হাজারো লিটল ম্যাগাজিনের যত না মৃত্যু হচ্ছে তার থেকে ঢের বেশি জন্মও হচ্ছে। কেন? কারা করছে এইসব? কলকাতার নামজাদা সংস্কৃতি সংস্থাগুলির পদধুলি না পড়লেও কীভাবে বহরমপুর, বাগনান, কোচবিহার, ব্যান্ডেল, গলসি আর ক্যানিং এর সাধারণ অডিটোরিয়ামগুলিতে প্রবল উৎসাহে বছরভর শ্যামা, শাপমোচন কিংবা মাঝেমধ্যেই সফল নাট্যোৎসব হয়ে চলেছে? মফস্বলে সন্ধ্যা নামলে অলিগলি থেকে আবৃত্তি ক্লাসের চিকণ ধ্বনিগুলো ভাসিয়ে দিচ্ছে কোন প্রজন্ম? জেলা থেকে ক্রমেই ব্লকেও কীভাবে ছড়াচ্ছে বইমেলা? কলকাতার সমস্যা হল কলকাতা মনে করে তার পিনকোড শেষ মানেই বাংলা শেষ। বাকি অঞ্চলগুলি কালচারের দিক থেকে অনেকটা পিছিয়ে। এই মনোভাব সার্বজনীন। উন্নতির অর্থ কলকাতার উন্নতি। তাই মুখ্যমন্ত্রীকেও দেখা যায় চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়নের জন্য শুধু বাঙুর হাসপাতাল কিংবা শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালেই সারপ্রাজি ভিজিট দেন। কিন্তু কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতাল আর গোসাবা ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র উপেক্ষিতই থেকে যায়। ঠিক সেই কারণেই যে বাংলা সিনেমাগুলিকে মননশীল আখ্যা দেওয়া হয় এবং সেগুলি নিয়ে তুমুল মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা চলে দিনের পর দিন তার সিংহভাগই মফস্বলের সিনেমাহলগুলিতে রিলিজই করা হয় না। কারণ প্রযোজক বা ডিস্ট্রিবিউটররা ধরেই নেন ওসব সিনেমা যেহেতু ভাবনার উদ্রেককারী এবং একান্তই নাগরিক ইস্যু তথা আধুনিক শহুরে সম্পর্কের টানাপোড়েনই উপজীব্য, তাই ওগুলো গ্রামে চলবে না। আর তাই বছরের পর বছর ধরে জেলা কিংবা গ্রামের বিনোদনের জন্য "পাগলু" অথবা 'পরাণ যায় জ্বলিয়া রে" বরাদ্দ। কারণ মফস্বলের মানুষ ওসবই পছন্দ করে। "হেমলক সোসাইটি" অথবা "অন্তহীন" হল আরবান ইন্টেলেকটের জন্য।

আসলে কলকাতার ধারণা, বাংলা মানেই কলকাতা এবং বাকি সব 'ইত্যাদি'। তাই বাংলায় ভাল নাটক হচ্ছে না। মানে হল কলকাতার গ্রুপগুলো ভালো নাটক করছে না। গোবরডাঙ্গা কিংবা এলাহাবাদ অথবা দিল্লিও যে করছে তার খোঁজ রাখার দরকার কী? বাংলা ভাষা ক্রমেই জগাখিচুড়ি হয়ে যাচ্ছে। মানে বালীগঞ্জ আর সল্টলেকের কথা বলা হচ্ছে। বলা হয় লোকসংস্কৃতির আগ্রহ বাংলা থেকে উঠে যাচ্ছে।তার মানে হল রবীন্দ্রসদন আর গিরীশ মঞ্চে লোকসংস্কৃতির কোনওউৎসব হয়নি অনেকদিন। সুতরাং আর যেন কোথাও হচ্ছে না।

এই মনোভাবের ফলে শেষ বিচারে সবথেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে কলকাতারই। ক্রমেই কলকাতা একটি কূপমণ্ডুক মানসিকতার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে। আত্মশ্লাঘায় আবদ্ধ থেকে মৌলিকতা উদ্ভাবন থেকে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। ভাবনার দিক থেকেও বদ্ধ এক মানসিকতার জলায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছে কলকাতার মূলস্রোতের সংস্কৃতি। তাই এখন টালিগঞ্জের ভালো সিনেমা মানেই হল নগরকেন্দ্রিক নিউক্লিয়ার পরিবারের মধ্যে গুটিকায় মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা, দিশাহীন প্রেম কিংবা সম্পূর্ণ হিউমার জ্ঞান রহিত ভাঁড়ামি। শেষ বিচারে এটা নিয়ে সন্দেহ নেই যে টিভির চ্যানেলগুলি না থাকলে এই সব সিনেমার অভিঘাত কর্পূরের মতোই উবে যেত স্বল্পদিনের মধ্যে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কী তাই নয়? বাঙালি শেষ কবে কোনও একটি বিশেষ উপন্যাস কিংবা ছোটগল্প নিয়ে আলোড়িত হয়েছে? কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে বাঙালি শেষ কবে প্রশ্ন করেছে, ওই লেখাটা পড়লি? এসবের কারণ হয়তো অনেক গভীরে প্রোথিত। এই সামান্য আলোচনায় প্রকৃত বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।

কলকাতা একটু চোখ মেলে ইগোর পরদা সরিয়ে চোখ প্রসারিত করলে দেখতে পাবে পৃথিবীজুড়ে বাঙালিজাতি কী নিরলস প্রয়াস করছে নিছক জাতি বৈশিষ্ট্য বাঁচিয়ে রাখার জন্য। আর সেটা যে কতটা কঠিন তা অভিজ্ঞতা ছাড়া উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। মজার কথা হল বাংলার মফস্বলগুলি না হয় পরিকাঠামো আর গ্ল্যামারের দিক থেকে কলকাতার কাছে লিলিপুট। কিন্তু কলকাতার ওই উন্নাসিকতা খোদ দিল্লির সম্পর্কেও বহাল তবিয়তে প্রযোজ্য। দিল্লির বাঙালির সংস্কৃতিকেও কলকাতা কিন্তু

একটু উপর থেকে তাচ্ছিল্যের চোখেই দেখে। সেটা স্পষ্ট হয় প্রতি বছর পুজোয়। দিল্লি, নয়ডা ও আশেপাশে দুর্গাপুজো হয় প্রায় সাড়ে ৪০০। বাংলায় যেমন সরস্বতী পুজো, পয়লা বৈশাখ, অক্ষয় তৃতীয়া, রথযাত্রা, বিশ্বকর্মা পুজো, নহালয়া, ভাইফোঁটা, কালীপুজো, ক্রিসমাস ইত্যাদি সত্যিই বারো মাসে তেরো পার্বনের উৎসবের অন্তহীন আবহ বিরাজ করে। দিল্লির বাঙালির কাছে সার্বিক উৎসব বলতে সেই সবেধন নীলমণি দুর্গাপুজোই। তাই আগস্ট মাস থেকেই দিল্লির বাঙালিদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় পুজো নিয়ে আলোচনা। চিত্তরঞ্জন পার্ক যে দিল্লির মধ্যে একটি মিনি বেঙ্গল সেকথা কেনা জানে। এই এলাকার দুটি মার্কেট আবার গোটা দিল্লির বাঙালির কাছে উইকএন্ডের গন্তব্য স্থল । এই কারণেই যে এখানেই পাওয়া যায় সার্বিক বাঙালি সংস্কৃতির আবহ। বাংলা গানের সিডি, বাংলার মতো ফুচকা, কমলা কিংবা অন্নপূর্ণা সুইটসের দই কিংবা রসগোল্লা। ঝালমুড়ি খেতে হলে এখানে না এসে উপায়নেই। দশকর্মা ভান্ডার, লাউডাঁটা থেকে বড়ি। এবং অবশ্যই মাছের বাজার।

চিত্তরঞ্জন পার্ক ছাড়া কী আর অন্যত্র বাঙালি থাকে না? অবশ্যই থাকে এবং রমরম করে থাকে। দিল্লির পুজো মানেই হল দু মাস আগে থেকে পাড়ায় পাড়ায় হয় কমিউনিটি হলে অথবা ক্লাবে কিংবা বাড়িতে বাড়িতে শুরু মহড়া। কোথাও মহড়া হচ্ছে চিত্রাঙ্গদার, কোথাও বা আধুনিক গানের সঙ্গে নৃত্য। কোথাও প্রবীণ বাসিন্দাদের নাটক। উদ্যোক্তাদের প্রধান সমস্যা হল কাদের কবে প্রোগ্রাম দেওয়া হবে। চোরা লবি করাও যে শুরু হয় না তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। সেই নিয়ে মন কষাকষি পর্যন্ত। কিন্তু দিল্লির পুজোর সবথেকে বড় আকর্ষণ হল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কলকাতা এবং মুম্বই থেকে প্রায় সমস্ত খ্যাতনামা শিল্পীই আসেন অনুষ্ঠান পরিবেশন করতে। এবং সেই নিয়ে বিভিন্ন পুজো কমিটির মধ্যে চলে গোপন প্রতিযোগিতা। কেউই ফাঁস করতে চায় না তাদের পুজোয় এবার কে আসেছন গান গাইতে বা নাটক করতে কিংবা নৃত্য পরিবেশনে। রীতিমতো মন্ত্রগুপ্তির মতো গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয়। শুধু ওই একটি বিষয়েই কালচারাল সেক্রেটারির দর সবথেকে বেশি। শুধুপুজো নয়, দিল্লিতে প্রায় সারা বছর ধরেই প্রধানত বাংলার প্রথম সারির শিল্পী আর সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের নিয়ে আসা হয় একটু উচ্চাঙ্গের আস্বাদ পেতে। আর এখানেই বেশিরভাগ সময়েই কলকাতা কিন্তু ঠকিয়ে যায়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা যায় এমন কিছু উপস্থাপনা করা হয় যেগুলির মধ্যে কোনও মননশীল ভাবনা অথবা আন্তরিক একাত্মতা থাকে না। দিল্লির বাঙালি, বাংলা তো তেমন চর্চায় নেই, সুতরাং আমাদের সেরাটা না দিলেও চলে। এরকম একটি অদ্ভুত মনোভাব কাজ করে। বিশেষ করে অধিকাংশ শিল্পী কিংবা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীই খুব চটুল এবং হালকা পরিবেশনেই মনোযোগী হন। তাঁরা হয়তো ভাবেন এখানে খুব বেশি গভীর বিষয় উপস্থাপন করলে এঁরা গ্রহণ করতে পারঙ্গম হবেন না। তাই বিখ্যাত নাট্যদলে নাটকই হোক অথবা খ্যাতনামা ব্যান্ডের গান, বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায় তাঁদের পরিবেশনার মধ্যে একটা ছেলেভুলানো মনোভাব কাজ করে। অ্যাকাডেমি কিংবা রবীন্দ্রসদন অথবা কলামন্দিরে যে অনুষ্ঠান হবে সেই একই অনুষ্ঠান কখনওই কিন্তু কলকাতার সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব দিল্লি কিংবা মুম্বইতে করেন না। কারণ হিসাবে তাঁদের মনের একটা প্রচ্ছন্ন ভাবনা কাজ করে। তা হল অডিয়েন্সের মান পৃথক। ঠিক সেই কারণেই দিল্লির ছেলেমেয়েদের গান কিংবা নায়ক নিয়েও কলকাতার উচ্চবর্নের মধ্যে একটা উপেক্ষার স্পর্শ আছে।

আসলে সার্বিকভাবেই বাঙালির মধ্যে সম্ভবত প্রবলভাবে ঢুকে পড়েছে মধ্য এবং নিম্নমেধার এক মারাত্মক প্রবণতা। আজকাল চর্চা, অনুশীলন কিংবা সাধনা ইত্যাদি শব্দগুলি হয়ে পড়েছে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক। সবক্ষেত্রেই চটজলদি ফলাফলের একটি প্রবল তাড়না কাজ করেছে আমাদের মধ্যে। তাই যে গান শিখছে তাঁর প্রধান লক্ষ্য যে কোনও একটি টিভি চ্যানেলের রিয়্যালিটি শোতে সুযোগ পাওয়া। অর্থাৎ খুব অল্প আয়াসে বিখ্যাত হওয়া। নিজের অর্থে একাধিক গানের অ্যালবাম প্রকাশ করেই আজকাল নামজাদা গাইয়ে হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া যায়। সাহিত্যেও তাই। পাঠকের ভাললাগার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সময় নষ্ট করতে কেউ রাজি নয়। প্রতিষ্ঠানের কাঁধে ভর করে এই কয়েকটি গল্প উপন্যাস লিখেই আজকাল পাওয়া যায় সেলেব্রিটি সাহিত্যিকের তকমা। লোকচক্ষুর আড়ালে নিভৃতে যাঁর পর্যবেক্ষণ আর অভিজ্ঞতার মিশেলে নতুন সৃষ্টি করার কথা, তাঁরা এখন ফেসবুক কিংবা সিনেমার চিত্রনাট্য কিংবা অ্যাওয়ার্ড ফাংশনে বেশি ব্যস্ত থাকেন। সম্ভবত আম বাঙালির সূক্ষ্ম রুচিবোধও ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হচ্ছে। তাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরগুলি এখন আর ঘন ঘন কলকাতায় হয় না। ডোভার লেনে যাওয়ার জন্য বছরভরের প্রতীক্ষা সাধারণ বাঙালির মধ্যেও দেখা যায় না। প্রযুক্তির চাকচিক্য আর আপাত শহুরে উপস্থাপনাকেই আমরা আধুনিক মনন হিসাবে ভাবতে শুরু করেছি। ফলে সবথেকে বেশি ধাক্কা খাচ্ছে সৃষ্টিশীলতা।

আমরা সাংস্কৃতিকভাবে অন্যদের থেকে এগিয়ে, এই ইগো আমাদের অনেক ক্ষতি করছে। কলকাতাকে কালচারাল হাব বলা হয় বলে বাঙালির একটা শ্লাঘা আছে। কিন্তু দিল্লির ঝাঁ চকচকে অডিটোরিয়ামগুলিতে নিয়ম করে বছরভর হাজারো অত্যন্ত উচ্চমানের সংস্কৃতি চর্চা হয়ে চলেছে। ইন্ডিয়ান হ্যাবিট্যাট সেন্টার, ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, শ্রীরাম সেন্টার, কামানি

অডিটোরিয়াম, ফিকি অডিটোরিয়াম, ললিতকলা অ্যাকাডেমি, সেন্টার অব মডার্ন আর্ট... ইত্যাদি কত সংস্কৃতি কেন্দ্র যে দিল্লির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এবং সেখানে রীতিমতো সাংস্কৃতিক মহাযজ্ঞ চলছে। দিল্লির যে কোনও গ্রুপের যে কোনও নাটকের টিকিটের দাম ধার্য হয় ২৫০ টাকা, ৩০০ টাকা, ৪০০ টাকা পর্যন্ত। এই তথ্যটি দেওয়ার অর্থ হল নাটক দেখার ক্রেজ কতটা বেশি তা বোঝানো। এবং বেশিরভাগ থিয়েটারই পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ। আর হ্যাঁ। বামপন্থার পেটেন্ট এবং কমিউনিস্ট সাহিত্যের রাজধানী এক ও একমাত্র কলকাতা এটাও ভেবে লাভ নেই। আসুন একবার ঘুরে যাবেন পশ্চিম দিল্লির নিউ রঞ্জিৎ নগরে। এই দোকানটির নাম হল 'মে ডে বুক স্টোর'। তাবৎ বামপন্থী সাহিত্য এখানে পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় কফি। বুকস্টোরের মধ্যেই সোফা রাখা আছে। আছে কফি দেওয়ার ব্যবস্থা। কিনতে না পারলে স্রেফ কফি নিয়ে বসে বসে পড়তে থাকুন। কফরি দাম? যে যেমন দেবে। কারণ সেই টাকা যাবে স্থানীয় বাচ্চাদের পড়ার বই কিনতে। শনি, রবিবার পা রাখার জায়গা থাকে না!

দিল্লিতে কলেজ স্ট্রীট নেই। এটা একটা বড় দুঃখ। তবে সেই দুঃখের একটি সামান্য ক্ষতিপূরণ হল দরিয়াগঞ্জের বইবাজার। প্রত্যেক রবিবার সাতসকাল থেকে পুরনো দিল্লির এই দরিয়াগঞ্জের ফুটপাথে অন্তত এক কিলোমিটার জুড়ে বসে পুরনো বইয়ের বাজার। সেখানে পাওয়া যায় অসংখ্য অমূল্য রতন। ছুটির দিনে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এই লালকেল্লা যাওয়ার রাস্তাটি ভিড়ে ছয়লাপ, শুধু বই ক্রেতার ভিড়ে। এটা নিয়ে সন্দেহ নেই যে ওই ভিড়ে যথেষ্ট সংখ্যক বাঙালিই থাকেন। চিত্তরঞ্জন পার্কের ২ নং মার্কেটে দাদুর দোকান কিংবা ময়ূর বিহারের সমাচার মার্কেটে যেতে হয় বাংলার তেলেভাজা খেতে। পূর্ব দিল্লির পূর্বাশা সংস্থায় প্রতি রবিবার সকালে ছোট ছেলেমেয়েদের বাংলা শেখানোর ক্লাস হয়। গোবিন্দপুরী এক্সটেনশন, কালকাজি এক্সটেনশন কিংবা তুঘলকাবাদ হল দিল্লির বাঙালি বাড়িগুলিতে দিনভর কাজ করা বাংলার বিভিন্ন গ্রামগঞ্জ থেকে আসা পরিচারিকাদের সংসার। স্বামীরা হয় রিকসা চালান অথবা বিভিন্ন ব্লক কিংবা সোসাইটিতে সিকিউরিটির কাজ করেন। আর তাঁরা সকাল হলেই দলে দলে বেরিয়ে পড়েন, নিজস্ব 'বউদি'দের বাড়িতে। হ্যাঁ। এঁরাও নিজেদের মতো পাড়ায় দুর্গাপূজা করেন। পুজোর আগে সলজ্জ ভঙ্গিতে বউদের বলেন, দাদাকে একটু বলুন না যদি একটু ডোনেশন জোগাড় করে দেন। এবার ঠাকুরের দাম খুব বেশি চাইছে।

এভাবেই বাঙালি প্রাণপনে শিকড়ের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখছে আর প্রতি বছর মে মাসে গরমের ছুটিতে কলকাতায় গিয়ে সম্বৎসরের অক্সিজেন আর অনেক গল্প আর হাঁসের ডিম নিয়ে ফিরে আসছে জুনের শেষ সপ্তাহে। কী আর করা যাবে... দিল্লির বেশিরভাগ জায়গায় বাঙালি হাঁসের ডিম পায় না যে! অগত্যা...।

আপনি কি জানেন?

১) Barbie doll-এর পুরো নাম Burbara Milicent Roberts.

২) টেলিফোনের আবিষ্কর্তা Alexandar Graham Bell কখনও তাঁর মাকে বা স্ত্রীকে ডেকে কথা বলতে পারেন নি। - কারণ দুজনেই কানে শুনতে পেতেন না।

৩) বিখ্যাত ইতালি চিত্রকার লিওনার্ডো-দ্য-ভিঞ্চি - কাঁচি আবিষ্কার করেছিলেন।

৪) পৃথিবীর প্রত্যেক মহাদেশের নাম ইংরেজিতে যে অক্ষর বা মাত্রায় শুরু হয়েছে, সেই অক্ষর বা মাত্রাতেই শেষ হয়েছে।

৫) Computer-এর key-boad-এর এক লাইনে সবথেকে দীর্ঘতম শব্দ হল Type writer

৬) ইংরেজ পার্লামেন্টে 'Speaker of the House" এর কথা বলার অনুমতি নেই।

৭) মধু হচ্ছে একমাত্র খাবার যেটা কখনও নষ্ট হয় না।

৮) গরম জল, ঠান্ডা জলের থেকেও আগে বরফে পরিণত হয়।

৯) দাবা খলায় 'check mate' কথাটা এসেছে পার্শিয়ান শব্দ 'Shah-Mat' কথাটা থেকে। এর মানে হল 'king is dead'.

১০) বিশ্ব ফুটবল কাপ প্রথম শুরু হয় ১৯৩০ সালে। দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়ে শহরে। এর প্রথম প্রবর্তক জুলে রিমের নামে ট্রফির নাম হয় 'জুলে রিমেঁ কাপ'। এই বিশ্বকাপের আসরে সর্বাধিক ২২ বার অংশগ্রহণ করে ব্রাজিল। সর্বাধিক বেশিবার জয়ী হয় ব্রাজিল ৫ বার, সর্বাধিক বার রাণার্স আপ হয় জার্মানি ৪ বার। সর্বাধিক Golden Boot পাওয়া ফুটবলার খেলোয়াড় হলেন পেলে - তিন বার।

স্মৃতির আলোয় - নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল এসোসিয়েশন

শ্রী সমীর ঘোষ
সদস্য এন.বি.সি.এ

উত্তর প্রদেশ ঔদ্যোগিক বিকাশ আইন ১৯৭৬ (U.P. Industrial Development Act, 1976) অনুযায়ী ১৯৭৬ সনে নয়ডা শহরের গোড়াপত্তন হয়। দিল্লির নিকট এই ছোট ঔদ্যোগিক ও আবাসিক শহরটিকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য নয়ডা প্রশাসন (Noida Authority) বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিল। ১৯৮১-৮২ সনে নয়ডায় কিছু সেক্টরে যথা ১২, ১৪, ১৫, ১৯, ২০, ২২, ২৬ ও ২৭ সেক্টরে লোক-বসতি আরম্ভ হয়। এই সব সেক্টরে কিছু কিছু বাঙালি পরিবারও বসবাস করতেন। সেক্টর সেক্টরে বাঙালি বসবাসকারী একে অন্যের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের মাধ্যমে অনেক ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। সকল বাঙালি একত্র হয়ে কিছু গঠনমূলক কাজ করার ইচ্ছাও সকলের মধ্যে গড়ে উঠে।

বাংলার বাইরে নয়ডার মত ছোট শহরেও বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তোলার একটি বাসনা সকলের মধ্যেই অঙ্কুরিত হচ্ছিল। এই ইচ্ছা পূরণ করার একমাত্র উপায় ছিল নয়ডার সকল বাঙালি পরিবারদের একত্র করা ও বাঙালিদের একটি নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলা। অতএব নয়ডার সমস্ত বাঙালি পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা ও সাক্ষাত করা ছিল আমাদের প্রথম কাজ, এই লক্ষ্য অনুযায়ী ১৯৮৩ সনে এপ্রিল-মে মাসে আমরা কিছু ব্যক্তি দল বেঁধে সেক্টরে সেক্টরে গিয়ে বাঙালি পরিবারদের চিহ্নিত করা শুরু করলাম। বিভিন্ন সেক্টরে বসবাসকারী বাঙালি পরিবারদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে আমরা বিশেষ আনন্দ-অনুভব করতাম। আলোচনার মাধ্যমে বাঙালিদের জন্য একটি সংগঠন গড়ার কথা জানাতাম, সফলেই আমাদের প্রস্তাবকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করত ও উৎসাহ দিত।

এরকম অবস্থায় ১৯৮১ সনে মে মাসের এক রবিবারে ১৯ সেক্টরের সি ব্লকে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে বাঙালি পরিবারদের জন্য একটি সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় বিভিন্ন সেক্টর থেকে প্রায় ৩০-৩৫ জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। সভার আরম্ভে সকলে নিজেদের পরিচয় দিলেন ও কোন সেক্টরের অধিবাসী জানালেন। এইভাবে আমরা একজন আর একজনের সাথে পরিচিত হলাম ও গড়ে উঠল একটি গোষ্ঠী

পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পর আমরা সভায় মিলিত হওয়ায় মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ নয়ডায় বাঙালিদের জন্য একটি নিজস্ব সংগঠন গড়ায় কথা সকলকে জানালাম। উপস্থিত ভদ্রলোকগণ নিজেদের মনের ইচ্ছা পূরণ হতে চলেছে ভেবে সব রকম সহযোগ ও সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। এটাও জানালেন যে তাহারা সকলেই এই প্রস্তাবে একমত ও উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য বদ্ধ পরিকর।

একটি সংগঠনকে রেজিস্টার্ড সোসাইটিতে রূপান্তরিত করার জন্য অনেক পরিশ্রম দরকার ও কাজটাও সময় সাপেক্ষ। এদিকে আবার দূর্গাপূজার সময়ও এগিয়ে আসছিল। সকলেই এই উৎসবের জন্য অপেক্ষা করছিল, সকলের একত্রিত হওয়ার আনন্দকে মুখরিত করার জন্য সভায় স্থির হল যে এই বছর আমরা নয়ডাতে প্রথম দুর্গাপূজার আয়োজন করব।

দুর্গাপূজার আয়োজন করার জন্য প্রথম একটা দুটা সভায় প্রশ্ন উঠে এল যে দুর্গাপূজার মতো মহোৎসব সুষ্টভাবে পালন করার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। আমরা মুষ্টিমেয় বাঙালি পরিবার কি ভাবে এই উৎসবকে সফল করতে পারব তাহা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এই অবস্থায় আমাদের মধ্যে উপস্থিত কিছু যুব ভদ্রমহোদয় কোন মতেই পিছু হঠতে রাজী হলেন না। তাদের বক্তব্য যে কোন উপায় নয়ডার দুর্গাপূজা ১৯৮৩ সনেই হবে। আমরা সকলে মিলে চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই এই অসাধ্য সাধন করতে পারব। অতএব ১৯৮৩ সালে নয়ডার প্রথম দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানের আয়োজন শুরু হল। এই ভাবে এই সভায় নয়ডা দুর্গাপূজা সমিতি নামে একটি কমিটি তৈয়ারী করা হল। উপস্থিত ভদ্রমহিলাদের মধ্যে কয়েকজনকে কার্যকরী সমিতির সদস্য মনোয়ন করা হল।

৫ দিন ব্যাপী দুর্গাপূজা পালন করার খরচ বাবদ ৩৫ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ হলো। নিজ নিজ সেক্টরে বাঙালি অবাঙালি নির্বিশেষে সকলের নিকট চাঁদা আদায়ের জন্য সকলকে নির্দেশ দেওয়া হল। পূজা উপলক্ষে একটি brochure প্রকাশিত করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করারও মনস্থ করা হল।

মায়ের পূজা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার জন্য একটি খোলা মাঠ ও সামিয়ানা দেওয়া একটি প্যান্ডেলের প্রয়োজন। এই মাঠ ভাড়া ও প্যান্ডেলের জন্য আনুমানিক ১০ হাজার টাকা ধার্য করা হল। এই সময় আমাদের এক সদস্য জানালেন যে নয়ডা প্রশাসন তাহাদের কর্মচারীদের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য ২৭ সেক্টরে একটি Recreation Hall তৈয়ারী করেছে। আমরা তৎক্ষণাৎ প্রশাসনের কাছে এই হলটি দুর্গাপূজা উপলক্ষে ব্যবহার করার জন্য আবেদন জানালাম। প্রশাসন আমাদের আবেদন মঞ্জুর করে হলটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিয়ে দুর্গাপূজা উৎসবের উপযুক্ত করে দিয়েছিল।

এই পুজায় ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত প্রতিদিন সকালে মায়ের পূজা ও পুষ্পাঞ্জলির ব্যবস্থা করা হত। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর দিন সকলের জন্য প্রসাদ ও ভোগ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সন্ধ্যায় আমরা সকলে মায়ের আরতি দেখার জন্য একত্রিত হতাম।

রাত্রে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। সমস্ত নয়ডার বাঙালি পরিবারের সদস্যরা এই অনুষ্ঠানে গান, গীতিনাট্য, নৃত্য, আবৃত্তি ও নাটক ইত্যাদি পরিবেশন করতেন। সকল শিল্পীদের কার্যকলাপ ও প্রতিভা আমাদের মুখরিত করত ও আমরা ভুলে যেতাম যে আমরা বাংলার বাহিরে বসবাস করছি অথবা প্রবাসী বাঙালি।

১৯৮৩ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত আমরা দুর্গোৎসব সেক্টর ২৭-এর Recreation Hall-তেই করতাম। বলাবাহুল্য, নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল এসোসিয়েশন গঠন হবার পর নয়ডা দুর্গাপূজা সমিতি সংগঠনের একটি অংশ (Sub-committee) হিসাবে কাজ করছে।

এটাও জানাই যে, ১৯৮৪ সনের সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠান করা হয় আমাদের এক সদস্যর ২৬ সেক্টবের বাড়িতে। একটা কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেব যে পূজা অনুষ্ঠানে মেতে উঠে আমরা কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য — নয়ডার বাঙালিদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ায় কথা ভুলে যাইনি। অতএব সরস্বতী পূজার পর ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ সনে নয়ডায় সকল বাঙালি পরিবারদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল এসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলার ব্যবস্থা হয়। এই সংগঠনের একটি সংবিধানও (constitution) এই সভায় গৃহীত হল। Register of Societies and Chit, Uttar Pradesh Meerut-এর নিকট, আমাদের উপরোক্ত এসোসিয়েশনকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য, সংবিধানের প্রতিলিপি সহ আবেদন পত্র পাঠান হয় ১৯৮৪ সালে মার্চ মাসে। ৩০শে মে ১৯৮৪ সালে Register of Society Chit Meerut আমাদের আবেদনপত্র মঞ্জুর করে নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল এসোসিয়েশনকে একটি রেজিস্টার্ড এসোসিয়েশন হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। Register of Societies Meerut থেকে অনুমোদন পাওয়ার পর নয়ডা প্রশাসনের (Noida Authority) নিকট কালী মন্দির স্থাপনের জন্য একখণ্ড জমির জন্য আবেদন আমরা জানাই। এই আবেদনপত্রের সহিত Register of Societies Meerut-এর অনুমোদন পত্র ও নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল এসোসিয়েশনের সংবিধানের প্রতিলিপি সংলগ্ন করা হয়।

কালীবাড়ী নির্মাণের জন্য জমি পাওয়া পর্যন্ত আমাদের কাছেকোন স্থায়ী ভারে মিলিত হওয়ার স্থান ছিল না। এতএব মাসিক সভা বিভিন্ন সদস্যদের বাড়িতেই আয়োজন করা হত। রবীন্দ্র জয়ন্তী বর্ষামঙ্গল ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হত সদস্যদের বাড়িতে বা খোলা মাঠে। এই সময় আমাদের তত্ত্বাবধানে একটি পাঠাগার (Library) সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই পাঠাগারটি ১৯ সেক্টরে আমাদের দুইজন সদস্যের বাড়ি থেকে কার্য করত। পাঠাগারের পুস্তকগুলিও সদস্যরাই দান করেছিল।

নয়ডা প্রশাসনকে জমির জন্য আবেদন পত্র দওয়ার পর আমরা প্রায়ই তাহাদের আমলাদের সাথে সাক্ষাত করেছিলাম আমাদের আবেদনপত্রের অবস্থান জানার জন্য। সবশেষে ১৯৮৫ সনের দুর্গাপূজার সপ্তমীর দিন প্রশাসন আমাদের এক চিঠিতে জানালেন যে তাহারা আমাদের আবেদন মঞ্জুর করে কালীবাড়ি নির্মাণের জন্য একখণ্ড জমি দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিস্তি জমা করার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। দূর্গাপূজায় উদ্বৃত্ত টাকা সহ আমাদের জমান টাকা প্রশাসনকে প্রথম কিস্তি হিসাবে জমা করা হয়। নয়ডা প্রশাসন তাদের কথামত ১৯৮৬ সনের জুন মাসে সেক্টর ২৬-এ কালীমন্দির নির্মাণের জন্য একখণ্ড জমি এসোসিয়েশনকে হস্তান্তরিত করে। বলা বাহুল্য ১৯৮৬ হতে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানও আমাদের নিজেদের জমিতেই পালিত হয়।

জমি অধিগ্রহণ করার পর আমরা মন্দির নির্মাণ কাজে তৎপর হলাম। প্রথমেই asbestos ছাদ দেওয়া দুটি ঘর নির্মাণ করা হয়। একটি ঘরে আমাদের পাঠাগার স্থানান্তরিত করা হয় ও অন্যটি অফিস ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হত। এইঘরে সকলের জন্য খেলাধুলার ব্যবস্থা ছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নাচ ও গান শেখানোর জন্য একটি ছোট স্কুলও খোলা হয়েছিল, প্রতি পূর্ণিমার দিন এই অফিস ঘরে সত্যনারায়ণ পূজার আয়োজন করা হত। পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যায় সত্যনারায়ণ কথা শোনার জন্য নয়ডায় সমস্ত বাঙালিরা মিলিত হত। পূজা শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হত।

১৯৮৬ সনে ১৬ই আগস্ট দিল্লির রামকৃষ্ণ মিশনের সচীব শ্রী স্বনন্দজী মহারাজের করকমল দ্বারা মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনা করা হয়।

ভিত প্রতিষ্ঠার পর মন্দিরের প্রথম তলের নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। সকলের নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করা হয়। বলাবাহুল্য অর্থ সংগ্রহের প্রধান উৎস ছিল দুর্গাপূজার উদ্বৃত্ত। সেইমত দুর্গাপূজা সমিতিকে প্রতি বছর অনরোধ করা হত যাহাতে তাহারা দুর্গাপূজার খরচা সীমিত রেখে যথাসম্ভব উদবৃত্ত এসোসিয়েশনের তহবিলে জমা করেন। মন্দিরের নির্মাণ কার্য্যে যাহাতে নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে চলে সেইদিকে নজর রাখেন। দুর্গাপূজা সমিতির সদস্যগণ আপ্রাণ চেষ্টা ও নিষ্ঠার সহিত এই

উদ্যোগে সাহায্য করতেন।

১৯৮২ সনে আমাদের মন্দিরের প্রথম তলের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়। মায়ের অষ্টধাতুর মূর্তির মন্দিরের দ্বিতীয় তলে প্রতিষ্ঠা করায় পরিকল্পনা ছিল। আমাদের মনে হল মন্দিরের দ্বিতীয় তল নির্মাণ করতে আরো অনেক সময় লাগবে। আরো কিছু দিন নয়ডায় বাঙালিদের মায়ের পূজা, অর্চনা হতে বঞ্চিত রাখায় সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে না। অতএব সাধারণ সভায় স্থির করা হল যে মন্দিরের প্রথম তলে মাকালীর মৃন্ময়মূর্তি স্থাপনা করে মায়ের নিত্য পূজার আয়োজন করা হোক। এসোসিয়েশনের এক আজীবন সদস্য এই মৃনম্ময়মূর্তির ব্যয়ভার গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৮৮ সালে কালীপূজার দিন মায়ের মৃন্ময় মূর্তি স্থাপনা করে ধুমধামের সাথে মায়েরপূজা অর্চনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই পূজায় নয়ডার প্রায় সকল বাঙালিরা উপস্থিত ছিলেন। সকলে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে মায়ের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। পূজাশেষে প্রসাদ ও ভোগের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মায়ের নিত্য পূজার জন্য মন্দিরে একজন পুরোহিত নিযুক্ত করা হল। নিত্য পূজায় ব্যয়ভার লাঘব করার জন্য কিছু কিছু সদস্যদের পরিবারের নিকট মাসিক ২০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করা হতো।

এই সময় আমাদের পাঠাগারও মন্দিরের প্রথমতলে নির্দিষ্ট কক্ষে স্থানান্তরিত করা হয়। এই পাঠাগারের নাম দেওয়া হল এস এন ব্যানার্জী মেমারিয়াল পাঠাগার। ১৯৮৯ সনের শিবরাত্রির দিন প্রস্তর নির্মিত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হল মায়ের মন্দিরের সংলগ্ন শিব মন্দিরে।

এইভাবে কালী মন্দিরে ও শিবমন্দিরে ভক্তদের সমাগম হতে লাগল।

ইতিমধ্যে মা কালীর অষ্টধাতু মূর্তি নির্মাণের কার্যভার পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত মূর্তি শিল্পী শ্রী পরেশ পালের উপর দেওয়া হয়েছিল। একটা কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি যে মায়ের অষ্টধাতু মূর্তির মূল্য ১ লাখ টাকা এক শিল্প প্রতিষ্ঠান দান করেছিল। এসোসিয়েশনের এক আজীবন সদস্যর প্রচেষ্টায় এই অর্থ সংগ্রহ করতে আমরা সক্ষম হয়ে ছিলাম। ১৯৯৪ সনের এপ্রিল মাসে মন্দিরের দ্বিতলে মায়ের গর্ভগৃহের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হল। কালীমূর্তি কৃষ্ণনগর থেকে আনা হল। ১৩ই মে ১৯৯৪ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মায়ের মূর্তির প্রতিষ্ঠানের দিন ঠিক করা হল। এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা উৎসবে সনাতন প্রথা অনুযায়ী ১২ জন পুরোহিত উপস্থিত ছিলেন। বেশিরভাগ পুরোহিতই কলিকাতার থেকে এসেছিলেন। দিল্লীর বিভিন্ন কালীবাড়ীর পুরোহিতরাও ছিলেন। তাহারা সকলে পূজা অর্চনা যাগযজ্ঞ বৈদিক মন্ত্রের মাধ্যমে মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রতিষ্ঠা পর্ব চলাকালীন নয়ডার সকল বাঙালিই উপস্থিত থেকে মায়ের আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। সেই দিনই দ্বিতলে শিবলিঙ্গকে শিবমন্দিরে স্থানান্তরিত করা হয়।

আমাদের সংগঠন বৈষ্ণব ও অন্যান্য সকল ব্যক্তির জন্য রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের কথাও ভেবেছিল। এই মত মা কালীর মন্দিরের সংলগ্ন রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের নির্মাণ কার্য সাথে সাথে আরম্ভ হল। ১৯৯৯ সনে এই নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হল। ১৪ই জুন ১৯৯৯ অনুষ্ঠানিক ভাবে রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এ অষ্টধাতুর যুগলমূর্তিও কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত মূর্তিশিল্পী শ্রীপরেশ পাল দ্বারা নির্মিত।

প্রথাগতভাবে ১২ জুন পুরোহিতের তত্বাবধানে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা হয়। পূজা, অর্চ্চনা, যাগযজ্ঞ ও বেদমন্ত্রের মাধ্যমে যুগল মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়।

এইভাবে মন্দিরের দ্বিতীয় তলে মাকালী, রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি ও শিবলিঙ্গ নিজ নিজ গর্ভ্গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এসোসিয়েশনের সংবিধানে মন্দিরে মূর্তি প্রতিষ্ঠা ছাড়াও আরো অনেক পরিকল্পনা ও পরিষেবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে ভক্তদের ও নয়ডাবাসীদের অল্প সময়ের জন্য থাকার ব্যবস্থা করার জন্য একটি ধর্মশালা নির্মাণের প্রকল্প ছিল। অতএব মন্দিরের সংলগ্ন জমিতে ধর্মশালা নির্মাণ করা স্থির করা হয়। ধর্মশালা ভবনের ভিত প্রতিষ্ঠার শিলান্যাস করেন নয়ডা প্রশাসনের অধ্যক্ষ শ্রীমতী সুমিত্রা খাণ্ডপাল ২০০০ সনে ৩০শে নভেম্বরের দিন।

ধর্মশালা ভবনের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয় ২০০৫ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে। মার্চ মাস হতে ধর্মসালা চালু হয়ে যায়। ৯ অক্টোবর, ২০০৫ সালে অনুষ্ঠানিক ভাবে ধর্মশালার উদ্বোধন করেন দিল্লীর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী শীলা দীক্ষিত।

গরীব দুঃখীদের চিকিৎসার জন্য একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা করার কথা আমাদের সংবিধানে উল্লেখ আছে, ডাঃ এস. কে. দাশগুপ্ত মেমোরিয়াল চিকিৎসালয় নামক একটি দাতব্য চিকিৎসালয় মন্দির প্রাঙ্গণে গরীবদুঃখীদের ও সমুহ লোকেদের চিকিৎসার সুবিধা দিয়ে থাকে। একজন এলোপ্যাথি ও একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক চিকিৎসালয়ের তত্বাবধান করেন। গরীব রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। প্রতি বছর মন্দির প্রাঙ্গণে রক্তদান শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়।

এসোসিয়েশনের সদস্যদের জন্য খেলাধূলা ব্যবস্থাও করা হয়। সময় সময় ক্রিকেট, ফুটবল কেরাম ইত্যাদির প্রতিযোগিতার আয়োজন ও এসোসিয়েশন করে থাকে।

আপনারা সকলেই মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপজা,

জগদ্ধাত্রী পূজা, কালীপূজা, বাসন্তী পূজা ও সরস্বতী পূজা ও সময় সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখেছেন। অতএব এই সম্বন্ধে আর কিছু নতুন বলার নেই।

সর্বশেষে একটা কথা আমি এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও এসোসিয়েশনের বরিষ্ঠ সদস্য হিসাবে বলতে পারি যে নয়ডার বাঙালীদের অন্যতম প্রতিষ্ঠান নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল এসোসিয়েশন আজ যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তার সমস্ত কৃতিত্ব সমগ্র নয়ডাবাসীর। নয়ডার বাঙালি বাসিন্দাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে আমাদের নিজস্ব একটি বাঙালি সংগঠন। বাঙালির মঙ্গল হউক।

সংগঠন প্রাঙ্গণে স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলন সমারোহ

সংগঠন প্রাঙ্গণে বস্ত্র বিতরন অনুষ্ঠান

কোথায় যে যাই...

কাজল দত্ত

বরদা এবং বরদার আশেপাশের শহরেও ছড়িয়ে পড়েছে স্রোতস্বিনীর প্রভাব। সদস্যের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। স্রোতস্বিনীর প্রগতিতে সদস্যদের কর্তারাও খুবই খুশি। মাঝে মাঝে ছোট ছোট কথা কাটাকাটি হলেও সেটা রোমাঞ্চকর।

প্রিয়ারা কয়েকদিন হয়েছে বরদায় এসেছে। সত্যব্রতর চাকরি বদল। কলকাতা থেকে বরদা। প্রিয়াকে স্রোতস্বিনীর মেম্বার করে দিয়ে এখন নিশ্চিত।

একদিন আমরা, মানে স্রোতস্বিনীর সদস্যদের কর্তারা মিলে আড্ডা দিচ্ছিলাম আমাদের ফ্ল্যাটে। মাঝে মাঝেই এরকম আড্ডা হয়। সত্যব্রত বলল — প্রিয়া বরদায় এসেই কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছিল। গান, বাজনা, বন্ধুবান্ধব সব নিয়ে মাতিয়ে ছিল কলকাতায়। গাছকে উপড়ে নিয়ে আসার মতন নিয়ে এসেছে ওদেরকে এই বরদায়। এই অভিযোগ প্রায়ই শুনতে হয়েছিল সত্যব্রতকে। স্রোতস্বিনীতে ঢুকে যাবার পর বরদা ছেড়ে যাবার চেষ্টা যাতে না করে — সত্যব্রতকে জানিয়ে দিয়েছিল প্রিয়া। সত্যব্রত এখন খুবই খুশি। অফিসের কাজ নিয়ে বেশ কাটছে দিনগুলো।

মনে মনে ভাবলাম কয়েকদিন পরেই কাজের চাপ অনেক বেড়ে যাবে। অফিসের নয়। স্রোতস্বিনীর কাজ। বৌকে রিহার্সালে নিয়ে যাওয়া, স্টুডিওতে ভোর সাতটার মধ্যে পৌঁছে দেওয়া, প্রোগ্রামের দিন কামাটিবাগে মশা তাড়ানোর ব্যবস্থা করা, স্টেজ সাজানো এবং সর্বশেষে রান্না সামলানো।

দেবেশ বলল যে আজকাল অফিস টাইমে স্রোতস্বিনীর কাজই বেশি করে। Souvenir জোগাড় করা, Advertisement-এর কাজ করা এবং আরও কত কি। চাকরী যায় আর কি। এই চিন্তায় ঘুমও কমে গেছে দেবেশের। দুই একবার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছিল। স্রোতস্বিনীর সব সদস্যরা ছেঁকে ধরেছিল দেবেশকে। অমিত বলেছিল দেবেশদা একদম ঘাবড়াবেন না। আমরা আছি। সামাল দেব। সৌগতও গলা মিলিয়েছিল অমিতের সাথে। পরে জানা গেছে যে অমিত, সৌগত এবং অন্যরাও লুকিয়ে লুকিয়ে স্রোতস্বিনীর অনেক কাজ করে দেয়। দেবেশ তাই হাল ছেড়ে দিয়েছে। হাল ছেড়ে দিয়েছে প্রায় সবাই। হাত লাগিয়েছে স্রোতস্বিনীর কাজে। ভালো লাগছে সবার। এইভাবেই সময়গুলো বেশ কেটে যাচ্ছে। কিন্তু ভাবিনি যে কয়েকদিন পরে

এক ভীষণ সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়বো।

স্রোতস্বিনীর গান, বাজনা, আড্ডা, রিহার্সাল... সবই হত আমাদের পুরানো ফ্লাটে। দূর থেকে সময় মতন পৌঁছে যাবার অসুবিধাটা ওদের কাছে কিছুই মনে হত না। মৌসুমী, রীণা এবং আরও কয়েকজন সদস্যরা আমায় ঘিরে ধরে একদিন বলল কাজলদা আপনার এই দুই বেডরুমওয়ালা ফ্ল্যাটে আর জায়গা হচ্ছে না। সেটা আমি অনেকদিন আগেই টের পেয়েছিলাম। ধীরে ধীরে ওরা প্রায় প্রত্যেকটা রুমই দখল করে নিয়েছিল। গানের আসর কিম্বা রিহার্সালের দিন অফিস থেকে ফিরে সিকিউরিটি গার্ড কিষাণ ভাই-এর সাথে গল্প করতাম।

বেশিদিন এই ভাবে কাটানো মুশকিল দেখে তিন বেডরুমওয়ালা ফ্ল্যাটে সিফট করে গেলাম। এই খবর শুনে রীণা, মৌসুমী এবং অন্যান্যরা খুবই খুশি। সবাই মিলে প্ল্যান করে ফেলল কোন রুমে কি হবে। ড্রইং রুমে আলাপ আলোচনা মানে মিটিং-গেষ্ট রুমে স্রোতস্বিনীর মিউজিকাল যন্ত্রপাতি থাকবে এবং গানের আসর... ইত্যাদি ইত্যাদি। দরকার অন্য দুটো রুমও মাঝে মাঝে লাগতে পারে — মিষ্টি হেসে জানিয়ে দিল জুঁই। সদস্যদের সংখ্যা বাড়ছে জায়গা তো বেশিলাগবেই। পাশ থেকে বলে উঠল রীণা এবং মৌসুমী। দেবেশ ও অমিত দুজনেই জোর গলায় বলল, কাজলদা ঠিকই বলেছে ওরা। কোনটা বেঠিক ভুলে গেছে অবিত, দেবেশ এবং অন্যান্যরা।

নতুন বাড়িতে কুরচি এবং জুঁই এর ইচ্ছে মতন আধুনিক জিনিসপত্র দিয়ে ঘর সাজানো হয়েছে। বিশেষ করে প্রত্যেকটা বাথরুম। একটা ট্যাপ ঘোরালেই চারদিকে থেকে ফোয়ারার মতন জল বেরোয়। প্রথম দিকে অসুবিধা হলেও এখন অভ্যেস সয়ে গিয়েছে। চিন্তা হচ্ছিল শ্বশুর শাশুড়িদের কথা ভেবে।

প্রত্যেক বছরের মতন এবারও ওনারা আসছেন বরদায়। কুরচি খুব খুশি। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই কুরচি দিদান দিদাইকে ঘরের সব বুঝিয়ে দিল। জানিয়ে দিল যে সব আধুনিক। প্রত্যেকটা ঘরেই অসংখ্য সুইচ দেখে আতকে উঠে শ্বশুরমশাই বললেন, কোনটা কার সুইচ বোঝাই মুশকিল।

সেদিন শনিবার। শ্বশুর-শাশুড়িদের নিয়ে বাইরে যাওয়ার প্ল্যান করলাম আমরা। অফিস থেকে তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরলাম। সবাই তৈরি। বসে চা খাচ্ছি হঠাৎ হাউমাউ করে চিৎকার করতে করতে শাশুড়ি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। সম্পূর্ণ শরীর ভিজে গেছে। জিজ্ঞাসা করতে জানতে পারলাম যে উনি বাথরুমে পা ধতে গিয়ে ভুল ট্যাপ ঘুরিয়েছেন। খুব অপ্রস্তুতে পড়তে হয়েছিল আমায়।

স্রোতস্বিনীর সদস্যরা কিন্তু খুবই খুশি এই নতুন বাড়িতে। কোথায় চা, চিনি, দুধ থাকে সবই জানা আছে তাদের। সবাই মিলে মিশে একটা বিশাল পরিবার গড়ে তুলেছে। শনিবারদিন মায়াদির হাতের কন্টিনেন্টাল খাওয়া, মাঝে মাঝেই অনামিকার স্পেশাল কচুরি আর গাজরের হালুয়া। রীণার বানানো কেক। রিহার্সালের দিন শুভম মিষ্টান্ন ভান্ডারের গরম গরম সিঙ্গাড়া — সব মিলিয়ে একটা আনন্দের পরিবেশ। বরদা ছেড়ে যাবার কথা কেউ আর ভাবতেই পারে না। আর ভাবার দরকারই বা কি! কয়েকদিন আগে আভাস পেলাম — স্রোতস্বিনীরা বাড়ির নেমপ্লেটে লিখবে, আমাদের নাম নয় লেখা 'ক্লাব স্রোতস্বিনী'। আমি ভাবতে বসলাম — এবার কোথায় যাই।

স্বাধীনতা দিবসে সংগঠন প্রাঙ্গণে বস্ত্র বিতরন অনুষ্ঠান

পাত্র চাই

বৈশ্য সাহা পাত্রী (৩১) এম.বি.এ, কর্মরতা, দিল্লী নিবাসী, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য স্ব/অসবর্ণ পাত্র চাই।

9560573322

M-148, Sector-25, Jalvayu Vihar

সংঘবার্তা

১৫ই আগস্ট পুণ্য দিন। প্রাচীন ভারতে নবীন ১৫ই আগস্টের পুণ্য দিনে সমিতির প্রাঙ্গণে হয়েছে পতাকা উত্তোলন। পরে দেশাত্মবোধক গান ও আলোচনা প্রবীন সদস্যদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে উৎসাহিত করেছে।

স্বাধীনতা দিবসে অন্য বছরের মত এবছরও দীন দুঃখীদের কাপড় বিতরণ করা হয়েছে। প্রায় ৫০০ মহিলা এই কাপড় পেয়েছেন।

রাখি পূর্ণিমার পুণ্য সন্ধায় মন্দিরে সত্যনারায়ণ পূজায় এবার ভক্ত সংখ্যা ছিল প্রচুর। পূজার শেষে ভক্ত এবং সদস্যরা প্রসাদ গ্রহণ করেন। প্রত্যেক বছরের মত এবছরও জন্মাষ্টমী তিথিতে মন্দির আলো এবং ফুল দিয়ে সাজানো হয় প্রায় মধ্য রত্রি পর্যন্ত চলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা। পূজাশেষে ভক্ত এবং উপস্থিত সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন মহালয়ার পুণ্য প্রভাতে চণ্ডীপাঠ শেষ হলে নয়ডার বাঙালিরা আসেন পিতৃতর্পণ করতে। তিথির নিয়মে তর্পণ শুরু হয় বেলা সাড়ে ন'টার পর। প্রায় ২০০ জন পুরুষ তর্পন করেন। তর্পন শেষে তাঁদের সকলকে চা জল খাবারে আপ্যায়িত করা হয়। দুর্গা পূজাতে মহা সমারোহ। ২৭-৯-২০১৪ থেকে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার মাধ্যমে শুরু হয় শারদ উৎসব।

২৮-৯-২০১৪তে সন্ধ্যায় আনন্দমেলা। বিচারকরা ব্যস্ত থাকেন রান্নার উৎকৃষ্টতা বিচারে।

৩০.৯.২০১৪ সন্ধ্যায় হয় দেবী প্রতিমার উন্মোচন, প্রধান অতিথি - মাননীয় সাংসদ শ্রী মহেশ শর্মা। সপ্তমীর সন্ধ্যায় আরতির পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রথম শিল্পী ছিলেন কলকাতা আগত শ্রীরূপঙ্কর বাগচি। পরে শ্রীমতী শম্পা কুণ্ডু। অষ্টমী অনুষ্ঠান এক কথায় ছিল অতুলনীয়। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার দিশারীর শিল্পীরা পরিবেশন করেন অপূর্ব লোক সঙ্গীত ও লোকনৃত্য। তারপর শ্রীমতী ব্রততী বন্দ্যোপাধায়ের ছড়া কবিতা। সবশেষে চন্দ্রবিন্দু গোষ্ঠীর বাংলা গান। নবমীর অনুষ্ঠানে ছিল এক তালবাদ্যের আস্বাদ। অনুষ্ঠান শুরু হয় শ্রী গোকুল দাসের বাংলার ঢাক অনুষ্ঠান দিয়ে। এই দলে মহিলা ঢাকীদের অনবদ্য বাজনা দর্শকদের অভিভূত করে। পরবর্তী শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত মেহের। শ্রীমতী মেহের কণ্ঠসঙ্গীতে সকলকে আনন্দ দান করেন।

দশমীর সকালে ছোটদের জন্য ছিল ম্যাজিক। মহিলারাও হাঁড়ি ফাটানো প্রতিযোগিতায় ভাগ নেয়।

শারদ উৎসবের প্রত্যেক দিন দুপুরে ভোগ প্রসাদ বিতরণ হয়। প্রায় তিন হাজার দর্শনার্থী প্রত্যেক দিন ভোগ গ্রহণ করেন। চার অক্টোবর সন্ধ্যায় যমুনাতে মায়ের মর্মর মূর্তির বিসর্জন হয়। পরে সন্ধ্যায় মন্দিরে শান্তিজলের পরে সকলে মিষ্টি গ্রহণ করেন।

আগামী ১৮ই অক্টোবর সন্ধ্যায় বিজয়া সম্মীলনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের দিন ধার্য্য হয়েছে।

সঙ্ঘের সদস্যদের বিনোদন সাপেক্ষে পরিচালন সমিতি এক আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা রেখেছিল গত ১৩ই জুলাই, রবিবার 'Carrom Competition' এই প্রতিযোগিতা পুরুষ এবং মহিলা উভয় বিভাগেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। সকল সদস্য এবং সদস্যাদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। সারাদিন ধরে প্রতিযোগিতা চলেছিল। প্রতিযোগীদের জন্য দুপুরের ভোজনের ব্যবস্থা সংঘের পক্ষ থেকেই করা হয়েছিল। সকাল এগারোটায় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন সঙ্ঘেরই প্রবীণ সদস্য শ্রী বিপ্লব দাশগুপ্ত। দুপুরে ভোজনের বিরতি রাখা হয়েছিল একঘন্টার। তারপর প্রতিযোগিতা শেষ হয় রাত্রি দশটায়। পুরস্কার বিতরণ করেন সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট শ্রী অনিল সাহা পুরুষদের একক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন এই সংঘেরই ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী রজত ব্যানার্জী। রানার্স আপ হন সংঘের সম্পাদক অমিয় দাস, পুরুষদের জুড়ি বিভাগে জয়ী হন শ্রী অমিয় দাস এবং শ্রী সুবীর দত্ত (বাপ্পা), রানার্স আপ ছিলেন শ্রী শান্তনু মণ্ডল এবং শ্রী সুদর্শন মুখার্জী। মহিলাদের একক বিভাগে জয়ী হন শ্রীযুক্তা কাকলি সরকার। রানার্স আপ হন শ্রীমতি শ্রেষ্ঠা মণ্ডল।

আমাদের পরবর্তী আয়োজন বিজয়া সম্মিলনী কালী পূজা এবং জগদ্ধাত্রী পূজা। নতুন আরও আকর্ষণী অনুষ্ঠানের চিন্তাধারা নিয়ে আজ শেষ করছি।

সাহিত্য চর্চায় আগ্রহী বন্ধুরা নীচের ঠিকানায় লেখাপাঠান:

সম্পাদক
সমন্বয়
নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন
ই৫ সি, কালীবাড়ী মার্গ, সেক্টর ২৬
নয়ডা ২০১৩০১
ফোন ০১২০- ২৫২২৮৩৬ / ৪৫৪৭৩৭৫

Published by Amiya Das, Secretary,Noida Bengali Cultural Association and printed by Delhi Paper Products.